ঈমানদার ব্যক্তিরাই প্রকৃত প্রগতিশীল

[বাংলা - Bengali - البنغالية]

লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর

সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ المؤمنون هم التقدميون الحقيقيون ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ لياقت علي عبد الصبور

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

ঈমানদার ব্যক্তিরাই প্রকৃত প্রগতিশীল

বিশ্ব এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। প্রকৃতি এখন মানুষের নিয়ন্ত্রণে। বর্তমানে গোটা পৃথিবী পরিণত হয়েছে একটি গ্রামে নয়, একটি পরিবারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ এখন পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যেও নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় অতীত দিনের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণায় পরিবর্তন আসা খুবই স্বাভাবিক।

মানব জীবনের স্বরূপ, তার কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন এবং বিশ্বে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারণে মানুষের চিন্তা-ভাবনা বারবার পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে। তাই বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ তার নিজস্ব গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস নতুন কোন বিষয় নয়। প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষের এ বিশ্বাস চলে আসছে। শিল্প বিপ্লব ও রেনেসাঁর ফলে বিশ্ব যখন নতুন মোড় নিতে শুরু করে তখনই এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, স্রষ্টার বিশ্বাস মানবজীবনের অগ্রগতি ও উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক।

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হলে প্রথমেই দেখা দরকার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্যে কি প্রয়োজন এবং তা কিভাবে অর্জিত হতে পারে?

প্রগতির জন্যে প্রয়োজন দৃঢ় মানসিকতা

মানুষকে অগ্রগতির পথে চালিত করে তার দৃঢ় মানসিকতা। যে ব্যক্তি সর্বদা সংশয় ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে তার পক্ষে কঠিন কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া যেকোন কর্মতৎপরতায় সাময়িক ব্যর্থতা আসতে পারে। তা সত্ত্বেও নিজ পদক্ষেপে দৃঢ় ও অবিচল থাকা গতিশীলতার লক্ষণ। সম্মুখে চলতে হলে যেকোন বাধা অতিক্রম করার মনোভাব থাকতে হয়। একজন ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যেই এরূপ দৃঢ়তা আসতে পারে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কারণে সে পৃথিবীর কোন শক্তিকেই ভয় পায় না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা করে সে যেকোন কঠিন পদক্ষেপ নিতে পারে। যেহেতু সাফল্য নির্ভর করে আল্লাহর মঞ্জুরীর উপর তাই সাময়িক ব্যর্থতায় সে সাহসহারা হয় না। ঈমানের বদৌলতে সে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে সাহসের সাথে।

দৃঢ়তা ভারসাম্যের পরিপন্থী নয়

কোন মুমিন ব্যক্তি নিজ কর্মে ও বক্তব্যে ভারসাম্য হারায় না। দৃঢ়তার নামে সে কোন নীতিকে অতিক্রম করতে পারে না। কারণ জবাবদিহিতার চিন্তা তাকে সীমালংঘন করার মানসিকতায় বাধ সাধে। নিজ জীবনের অগ্রগতি সাধন করতে গিয়ে সে অন্যের অনিষ্টের কথা চিন্তা করতে পারে না। পার্থিব উন্নতির জন্যে শত প্রচেষ্টায় লিপ্ত থেকেও সে পরকালের কল্যাণের কথা স্মরণ রাখে। তার চরিত্রের দৃঢ়তা তাকে নীতির উপর অটল রাখে।

চরিত্র মানসিকতার পরিচায়ক

মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় তার চরিত্রের বিচারে। উন্নত চরিত্রের লোকই সমাজের প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে। উন্নত চরিত্র ঈমানের পরিচয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘সর্বোত্তম চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিই সবচেয়ে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী।’

চরিত্র দ্বারা মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যার মনোভাব যেরূপ, তার চালচলন ও জীবনধারা সেরূপই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি স্বচ্ছ মনের অধিকারী তার ক্রিয়াকলাপে এর স্বচ্ছতা ফুটে উঠে। মানুষের প্রতি ভালবাসা যার অন্তরে বদ্ধমূল থাকে, সে কাউকে কষ্ট দিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভোগবাদী চিন্তাধারায়

চালিত হয়, তার প্রবণতা থাকে শুধুমাত্র আত্মতুষ্টি। জগতের সবাই গোল্লায় গেলেও সে নির্বিকার থাকতে পারে। মূলতঃ মানসিক প্রবণতাই মানুষকে সৎ কিংবা অসৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মই চরিত্রের চিত্র আর চরিত্র মানসিকতার দর্পণ।

বিশ্বাস চরিত্র নির্ধারণ করে

একজন ঈমানদার ব্যক্তির চরিত্র হয় নির্মল। ঈমান তাকে উন্নত জীবনের দিশা দান করে। সবরকমের অনর্থক ও অকল্যাণকর ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত রাখতে ঈমানের কোন বিকল্প নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইহকাল সর্বস্ব জীবনে বিশ্বাসী, তার চরিত্র কখনই উন্নত হতে পারে না। মায়া-মমতা, করুণা, পরোপকার তার দৃষ্টিতে অনর্থক। প্রগতির সংজ্ঞা এখানে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। জনকল্যাণ হবে প্রগতির পরিপন্থী। বিশ্বাসের কারণেই তার কর্মে গতি সঞ্চারিত হয়। ইহজাগতিক কিংবা পরকালীন জীবনবোধ মানুষকে তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। অতএব চরিত্র গঠনের জন্যে বিশ্বাস হলো পূর্বশর্ত।

নাস্তিকরা ভীরু

মাঝ দরিয়ায় যখন তুফান ওঠে, তখন মুমিন ব্যক্তিই অবিচল থাকতে পারে। নাস্তিকরা নয়। মুমিন জানে, আল্লাহর পক্ষ থেকেই সবকিছুর ফয়সালা হয়। অতএব তিনিই রক্ষা করতে পারেন। নাস্তিকরা এ সময় কোন কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। তাই তারা জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়ে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরূপ নৈরাশ্য অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে না। অন্যদিকে একজন মুমিন সবসময় আশাবাদী হয়ে থাকে। ফলে যেকোন বিপদে সে ধৈর্য ধারণ করে নিজ কর্তব্য কর্মে লিপ্ত থাকে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্যে যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রয়োজন তা মুমিনের জীবনেই পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, পরকাল মানে না, সে কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক লাভ-ক্ষতিই বুঝে থাকে। তাই বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা তার চরিত্রের পরিপন্থী। অথচ পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রথম শর্তই হলো ধৈর্যধারণ করা।

প্রগতির নামে বিভ্রান্তি

ইসলামের মতে দুনিয়ার বস্তুসমূহের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষ তার প্রতিনিধি মাত্র। কেবল আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেকই সে তার ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু প্রগতিবাদীরা স্রষ্টার মৌল মালিকানার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এবং মানুষকেই আসল মালিক বিবেচনা করে। আল্লাহ তথা স্রষ্টা সম্পর্কিত ধারণাকে একেবারে পরিত্যাগ করার ফলে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার মনোভাবও তাদের নেই। তাই তারা হয়ে ওঠে আত্মপূজারী। চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়। তাদের অশুভ চিন্তা ও অসৎকর্মের ফলেই বিজ্ঞান পরিণত হয় মানুষের ধ্বংসের হাতিয়ারে। তারা নৈতিকতার পরিবর্তে আত্মপূজা, প্রদর্শনেচ্ছা, অবাধ্যতা ও উচ্ছৃংখলতাকে বেছে নেয়। অর্থ ব্যবস্থার উপর চাপিয়ে দেয় স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনার বোঝা। সমাজজীবনে বিলাসপ্রিয়তা ও আত্মকেন্দ্রিকতার মারাত্মক বিষ ছড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা, বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য এবং শক্তিপূজার দুষ্ট তীর বিঁধে মানবতার পক্ষে নিকৃষ্টতম এক অভিশাপ নেমে আসে। ফলকথা, তথাকথিত প্রগতিবাদ মূলতঃ এক বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে যা কৃষ্টি ও সভ্যতার এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। সে বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট হলেও প্রকৃত পক্ষে তা দূষিত। তার ফুল দেখতে সুন্দর হলেও তাতে রয়েছে কাঁটা। তার শাখা-প্রশাখায় শোভাবর্ধন করলেও তা থেকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তা অত্যন্ত বিষাক্ত এবং তার প্রভাবে গোটা মানবতা আস্তে আস্তে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়।

প্রগতিবাদের প্রবক্তারাই এখন নিজেদের দর্শনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কারণ এতে জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্রে এমন বিভ্রান্তি, জটিলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে যে, তা সমাধানের কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং এক জটিলতা দূর করার প্রচেষ্টা থেকে অসংখ্য নতুন জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তারা পুঁজিবাদের

অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সমাজবাদের আবিষ্কার করলো। কিন্তু তা থেকে জন্ম নিলো মানবতার আরেক শত্রু কম্যুনিজম। গণতন্ত্রের বিকল্প অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঘটালো। সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান করতে গিয়ে তারা যে পদক্ষেপ নেয়, তা থেকে আত্মপ্রকাশ ঘটে নারীত্ববাদের। নৈতিক উচ্ছৃংখলতা প্রতিকারের জন্যে কোন আইন করলে আইনলংঘন ও অপরাধপ্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মোটকথা, কৃষ্টি ও সভ্যতার নামে এমন এক বিষবৃক্ষ জন্ম নিয়েছে যা থেকে বিকৃতি ও বিশৃংখলার দূষিত বায়ু প্রবাহিত হয়ে মানবজীবনকে দুঃখকষ্টের অন্তহীন গহ্বরে নিক্ষেপ করে। মানব সমাজের প্রতিটি অংশ তাকে তাতে জর্জরিত করে।

প্রগতিবাদীরা এখন নিজেদেরই অর্জিত ব্যাধির যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। তারা এখন উদ্বেল। কোন অমৃতরসের সন্ধানে তারা ছটফট করছে। কিন্তু সে অমৃতরসের উৎস তাদের জানা নেই। তাই নিজেদের ক্যান্সারদুষ্ট দর্শনকে মলম লাগিয়ে নিরাময়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নিজেদের দর্শনের মৌলিক দুর্বলতা ও অনিষ্ট তাদের অনেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু যেহেতু তারা কয়েক শতাব্দী ধরে ঐ ভাবধারায় গড়ে উঠেছেন সেজন্যে তাদের মন-মগজে বিকল্প উৎসের কোন ধারণাই আসে না। তারা অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে তাদের যন্ত্রণা উপশমকারী কোন জিনিসের সন্ধান করছে। কিন্তু তাদের অভীষ্ট বস্তুটি কি এবং তা কোথায় পাওয়া যাবে– এখবরই তাদের জানা নেই।

ইসলামের উপর অপবাদ

আধুনিককালের অনেক বিদ্যাভিমানী মন্তব্য করে থাকেন– ইসলামী জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার অর্থ বর্বর যুগে এবং তাঁবুর যুগে ফিরে যাওয়া। ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরনের সন্দেহ আরোপ করা হয় কোন যুক্তি বিচারের তোয়াক্কা না করে। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকলেও তারা এ বিষয়ে একমত হবেন যে, ইসলাম সভ্যতা ও প্রগতির পথে কখনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

ইসলাম এমন এক জনসমাজের মাঝে নাযিল হয়েছিল, যারা বেশির ভাগই ছিল বেদুঈন। তারা ছিল অত্যন্ত নির্মম ও কঠোর প্রকৃতির। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো, এসব উগ্র ও পাষাণ প্রকৃতির লোকেরা ইসলামেরই প্রভাবে একটি মানবিক গুণসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তারা কেবল নিজেরাই সুপথপ্রাপ্ত হয়নি বরং মানুষকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার নেতৃত্বও লাভ করেছিল। মানুষকে সভ্যতার আলো প্রদান করা ও আত্মার বিকাশ সাধন ছিল ইসলামের অলৌকিক ক্ষমতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আত্মার উন্নতি সাধন মানুষের সকল চেষ্টা ও সাধনার মূল্য লক্ষ্য হতে পারে। কারণ এটিই সভ্যতার অন্যতম চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু ইসলাম কেবল আত্মিক উন্নতি সাধন করেই ক্ষান্ত হয়নি। সভ্যতার যেসব বিষয় বর্তমানে মানুষের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং যাকে অনেকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করেন, ইসলাম তার সবগুলোকেই গ্রহণ করেছে। ইসলামের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক না হলে মুসলমানেরা সব দেশের সভ্যতাকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। গ্রীক সভ্যতা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র গ্রহণ করে ইসলাম এসবের পৃষ্ঠাপোষকতা প্রদান ও সমৃদ্ধ করেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন অবদান পেশ করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইসলাম গভীর ও একনিষ্ঠ প্রেরণা যুগিয়েছে। স্পেনের ইসলামী বৈজ্ঞানিক অবদানের উপরই ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও তার আধুনিক আবিষ্কারগুলোর ভিত্তি গড়ে উঠেছিল।

মানবতার সেবায় নিয়োজিত কোন সভ্যতাকে ইসলাম কখনই বিরোধিতা করেনি। অতীতের প্রতিটি সভ্যতার প্রতি ইসলামের যে মনোভাব ছিল বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিও তার মনোভাব সে রকমই। ইসলাম এসব সভ্যতার মহৎ অবদানগুলো গ্রহণ করেছে, আর ক্ষতিকর দিকগুলো পরিহার করেছে।

সভ্যতা যতক্ষণ পর্যন্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে, ততক্ষণ ইসলাম তার বিরোধিতা করে না। কিন্তু সভ্যতা ও প্রকৃতি বলতে যদি মদ্যপান, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির মত উচ্ছৃংখলতা ও অনৈতিকতা বুঝায়, তাহলে ইসলাম অবশ্যই তার বিরোধিতা করে এবং এর বিষাক্ত ছোবল থেকে মানবতাকে রক্ষার জন্যে যথাসম্ভব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে অনুসারীদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায়।

প্রগতির সঠিক অর্থ

মানুষকে উদ্দেশ্যহীন, কর্তব্যহীন, দায়িত্বহীন, অর্থহীন করে সৃষ্টি করা হয়নি। নিরুদ্দেশের যাত্রী বানিয়ে মানুষকে ছেড়ে দেয়া হয়নি এ বিশাল জগত পরিসরে। মানুষকে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির মূলে রয়েছে সূক্ষ্ম যৌক্তিকতা ও কৌশল। আল্লাহকে জানা এবং আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানুষকে আল্লাহর খলিফারূপে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে নানা প্রকারের বাধা-বিপত্তি ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এসব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নিজের মৌল উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হওয়াই প্রগতির আসল অর্থ। ইসলাম মানুষকে সে শিক্ষাই দেয়। ইসলাম বলে ঃ মানুষ বাঁচবে তার মহান আল্লাহর জন্যে। বেঁচে থাকবে তার পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ– সে জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। এরূপ জীবন পরিচালিত করাই প্রকৃত প্রগতি।

সমাপ্ত